মৌলিক অধিকার, আইনের অনুশাসন ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ

(Fundamental Rights, Rule of Law and Separation of Power)

দ্বিতীয় অধ্যায়

❖ ২.১ ভূমিকা (Introduction):

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের সর্বাধিক বিকাশ সাধনই হল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যেই নাগরিকদের বিশেষ অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকার ও সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল মৌলিক অধিকার। জাতিপুঞ্জের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাতেও (Universal Declaration of Human Rights) মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের, স্বাধীনতার, নিরাপত্তার ও দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার সমেত কতকগুলি অধিকার ভোগের অধিকার আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে সকলে সমান হয়ে জন্মেছে। তাই জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে সকলেই কতকগুলি অধিকার প্রয়োজন। এই সমস্ত অধিকার হস্তান্তরের অযোগ্য।

মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার দরকার। এই সমস্ত অধিকারের মধ্যে কতকগুলি দেশ ও কালের আপেক্ষিক এবং পরিবর্তনশীল। আবার মানুষের জীবন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে সকল অধিকারের গুরুত্বও সমান নয়। কিন্তু কতকগুলি অধিকার সুস্থ ও সভ্য জীবনযাপনের পক্ষে একান্তভাবে অপরিহার্য। তাই অধিকারগুলি প্রায় সকল দেশেই স্বীকৃত। এই সমস্ত অধিকারকে অস্বীকার করলে নাগরিকদের সহজ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অপরিহার্য অধিকারগুলিই মৌলিক অধিকার হিসাবে গণ্য হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং ব্যক্তির জীবনকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার অপরিহার্য।

❖ ২.২ মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা (Definition of the Fundamental Rights):

মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়, তা এক কথায় বলা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সাধারণভাবে বলা যায়, নাগরিক অধিকারসমূহের মধ্যে যেগুলি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়, সেগুলিকে মৌলিক অধিকার বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এম. এম. সিং-এর মতে, প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে যেসব অধিকারের উৎস নিহিত থাকে, সেগুলিকে মৌলিক অধিকার বলে বর্ণনা করা যায়। অন্যান্য অধিকারের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের জন্যই এইসব অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (1950) রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি পাতঞ্জলি শাস্ত্রী এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে লিপিবদ্ধ "মৌলিক অধিকারগুলি হল মৌলিক।" কারণ, চরম সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে জনগণ তাদের নিজেদের জন্য এগুলিকে নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্তৃত্বের বাইরে এইসব অধিকার রয়েছে বলে এগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়।

এর অর্থ—মৌলিক অধিকারগুলি হল সেইসব অধিকার, যেগুলি রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ওপর সীমাবদ্ধতা বা বাধানিষেধ (limitations or restrictions) আরোপ করতে সক্ষম। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পাতগুলি শাস্ত্রী বলেছিলেন যে, সংবিধানের তৃতীয় অংশের সামগ্রিক লক্ষ্য হল—ওই অংশে বর্ণিত স্বাধীনতা ও অধিকার সমূহকে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষণ করা। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন-ও মন্তব্য করেছিলেন যে, মৌলিক অধিকারগুলিকে রাষ্ট্রের ওপর আরোপিত বাধ্যবাধকতা হিসেবেই গড়ে তোলা হয়েছে। এখানে 'রাষ্ট্র' বলতে শাসন বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগকে বোঝায়। আর. সি. কুপার বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় (1973) সুপ্রিমকোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেছিল যে, কোনো ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের মৌলিক অধিকার সমূহের ওপর ফলাফলের নিরিখে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপকে অবশ্যই বিচার করতে হবে।

❖ ২.৩ মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অন্যান্য অধিকারের পার্থক্য (Differences Between Fundamental Rights and Other Rights):

মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অন্যান্য অধিকারের আলোচনা করলে উভয়ের মধ্যে কতগুলি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এইসব পার্থক্যের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল—

(১) সংবিধান কর্তৃক মান্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য:

দেশের সাধারণ আইন (The ordinary law of the land) নাগরিকদের সাধারণ আইনগত অধিকারগুলি (ordinary legal rights)-কে সংরক্ষণ করে। কিন্তু মৌলিক অধিকার সমূহ রাষ্ট্রের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও রক্ষিত হয়। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দুর্গাদাস বসু বলেছেন, "মৌলিক অধিকার হল এমন একটি অধিকার, যা রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত ও প্রতিশ্রুতিকৃত" ("protected and guaranteed by the written constitution of the state")।

(২) পবিত্রতার ক্ষেত্রে পার্থক্য:

মৌলিক অধিকারগুলি দেশের মৌলিক আইন অর্থাৎ সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় বলে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোনো কাজ, নির্দেশ, আদেশ প্রভৃতি এগুলির বিরোধী হলে আদালত সেগুলিকে বাতিল করে দিতে পারে। এইভাবে আদালত মৌলিক অধিকারগুলির পবিত্রতা রক্ষা করে। কিন্তু আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন কিংবা শাসন বিভাগীয় কোনো কাজ বা আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি সাধারণ অধিকারের বিরোধী হলেও আদালত সেগুলিকে বাতিল করতে নাও পারে। কারণ, সাধারণ অধিকারগুলি মৌলিক অধিকারের মত পবিত্র বলে বিবেচিত হয় না।

(৩) পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্থক্য:

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলিকে 'মৌলিক' ('fundamental') বলা হয়। কারণ, সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতি অনুসারে পার্লামেন্ট এগুলির পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। সেজন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাধারণ অধিকারের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযুক্ত হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, সংবিধান সংশোধন ছাড়াই সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পার্লামেন্ট সাধারণ অধিকারগুলির পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম।

(৪) আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্যতার ক্ষেত্রে পার্থক্য:

অনেক সময় আদালত কর্তৃক বলবৎ যোগ্যতাকে সাধারণ অধিকার এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে, মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে বলবৎযোগ্য। তাই এরূপ অধিকার ভঙ্গ করা হলে আদালত তা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু সাধারণ অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। কিন্তু এরূপ ধারণা সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে দুর্গাদাস বসু তাঁর 'ইনট্রোডাকশন টু দ্য কনস্টিটিউশন অব্ ইন্ডিয়া' নামক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশের বাইরে আদালত কর্তৃক 'বলবৎযোগ্য' ('justiciable') কোনো অধিকারের অস্তিত্ব নেই- এ কথা মনে করা সমীচীন নয়। কারণ, সংবিধানের অন্যান্য ধারায় রাষ্ট্রের ওপর নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা (limitations upon the State) আরোপ করা হয়েছে এবং এইসব সীমাবদ্ধতা কার্যত কিছু কিছু ব্যক্তিগত অধিকারের জন্ম দেয়। শাসন বিভাগ কিংবা আইন বিভাগ তাদের ওপর আরোপিত সীমাবদ্ধতা বা বাধানিষেধ উপেক্ষা করে কাজ করলে যে কোনো ব্যক্তি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে এবং আদালতও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে মৌলিক অধিকার বলে বিবেচিত না হলেও সেটিকে একটি সাংবিধানিক অধিকার' ('a constitutional right') হিসেবে সুপ্রিমকোর্ট স্বীকৃতি প্রদান করেছে (বিশাম্বর বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলা, 1982)। সংবিধানের 300-ক নং ধারা অনুসারে বেআইনিভাবে এই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না (Persons not to be deprived of property save by authority

of law)। তা করা হলে যে কোনো ব্যক্তি আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। তবে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট মৌলিক অধিকারগুলিকে বলবৎ করার জন্য যেসব লেখ (Writs), আদেশ (Orders) ও নির্দেশ (Directions) জারি করতে পারে, অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে তা করতে পারে না।

❖ ২.৪ সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা [Necessity for incorporating Fundamental Rights in the Constitution]:

➢ বিপক্ষে যুক্তি (Arguments Against):

সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহকে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এ. ভি. ডাইসি প্রমুখ সংবিধান বিশেষজ্ঞ মনে করেন, যেহেতু সাধারণ আইনের দ্বারা নাগরিক অধিকারগুলি সংরক্ষিত হতে পারে, সেহেতু সেগুলিকে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় হ্যামিল্টন (Hamilton) এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, জনমত এবং জনসাধারণ ও সরকারের সাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা (the general spirit of the people and government)-র দ্বারাই অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হতে পারে।

➢ সপক্ষে যুক্তি (Arguments For):

অনেকে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিরূপ অভিমত প্রকাশ করলেও টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) ও আরও অনেকে এই যুক্তি মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা সংবিধানে অধিকার সমূহ লিপিবদ্ধ করার পক্ষে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেন। এই বিতর্কে শেষপর্যন্ত জেফারসনদের অভিমত প্রাধান্য লাভ করে। যাই হোক, প্রধানত নিম্নলিখিত যুক্তিতে ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহের লিপিবদ্ধকরণ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করা হয়: (১) বহুত্ববাদী সমাজে জাতি গঠন, (২) বিভিন্ন দেশের অনুকরণ, (৩) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন, (৪) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন, (৫) গণচেতনা বিকাশের জন্য প্রয়োজন, (৬) অধিকারগুলিকে মৌলিক আইনের মর্যাদাদানের জন্য প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হলেই যে জনসাধারণ তা পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করতে পারবে—এমন কোনো কথা নেই। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার গুলি জনসাধারণ ততদিন পর্যন্তই ভোগ করতে পারে, যতদিন পর্যন্ত প্রচলিত বৈষম্য মূলক সমাজব্যবস্থার স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। কিন্তু এই স্থিতাবস্থা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণি নানা উপায়ে, বিশেষত সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাদের অধিকার

থেকে বিচ্যুত করতে দ্বিধা-বোধ করে না। এরূপ ক্ষেত্রে সংবিধানে মৌলিক অধিকার সমূহকে লিপিবদ্ধ করেও সরকারের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তিকে প্রতিরোধ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলে মনে করা হয়। ভারতের ক্ষেত্রেও একই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

❖ ২.৫ ভারতীয় সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Fundamental Rights incorporated in the Constitution of India):

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে যেরূপ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, বিশ্বের অন্য কোনো দেশের সংবিধানে সেরূপ করা হয়নি। ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ও ঘোষিত মৌলিক অধিকারগুলির বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বৈশিষ্ট্যগুলি হল-

১. বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও তত্ত্বের প্রভাব:

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করার সময় সংবিধান প্রণেতাগণ বিভিন্ন উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান ও তত্ত্বের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে 'মানবাধিকার-সংক্রান্ত ফরাসি ঘোষণা', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অধিকারের সনদ' (Bill of Rights), ডাইসি (Dicey)-র 'আইনের অনুশাসন' তত্ত্ব, গান্ধিবাদ প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

২. শাসন ও আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মৌলিক অধিকারগুলিকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা:

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি ভারতের গণতান্ত্রিক চরিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। সংবিধানের 13 নং ধারায় অধিকারগুলিকে শাসনবিভাগ ও আইনসভার হস্তক্ষেপ থেকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ভারতে যেসব আইন কার্যকর ছিল, সেগুলি মৌলিক অধিকারসমূহের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হলে বাতিল হয়ে যাবে [13 (1) নং ধারা]। তা ছাড়া, সংবিধানের তৃতীয় অংশে প্রদত্ত অধিকারগুলিকে হরণ বা ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। এরূপ কোনো আইন প্রণীত হলে তার যে-অংশ মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হবে, তা বাতিল হয়ে যাবে [13(2) নং ধারা]। 'আইন' বলতে কী বোঝায়, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 13(3) (A) নং ধারায় বলা হয়েছে, যে-কোনো অধ্যাদেশ (ordinance), আদেশ (order), উপ-আইন (bye law), নিয়ম (rule), প্রনিয়ম (regulation), বিজ্ঞপ্তি (notification), রীতি (custom) বা প্রথা (usage)-কে বোঝাবে।

৩. নেতিবাচক ও ইতিবাচক মৌলিক অধিকার:

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- (a) নেতিবাচক (negative) অধিকার এবং (b) ইতিবাচক (positive) অধিকার। যেসব অধিকার রাষ্ট্রের প্রতি নিষেধাজ্ঞামূলক, সেগুলিকে নেতিবাচক অধিকার বলা হয়। আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইন

কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার (14 নং ধারা); জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধার অধিকার [15 (1) নং ধারা]; জীবন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার (21 নং ধারা) প্রভৃতির কথা এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব অধিকার নাগরিকদের প্রদান করতে গিয়ে রাষ্ট্র কী কী করতে পারবে না, সে কথাই বলা হয়েছে। আবার, কতকগুলি অধিকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে প্রদান করা হয়েছে। এগুলিকে ইতিবাচক অধিকার বলা হয়। উদাহরণ হিসেবে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার [19 (1) নং ধারা], শিক্ষার অধিকার (21,A নং ধারা) ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

৪. আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য:

ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অধিকারগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণিভুক্ত অধিকারগুলিকে মৌলিক অধিকার (তৃতীয় অংশ) এবং দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত অধিকারগুলিকে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy) (চতুর্থ অংশ) বলে অভিহিত করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য; কিন্তু নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

৫. অধিকারগুলি অবাধ নয়:

ভারতীয় নাগরিকদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মৌলিক অধিকার গুলিকে অপরিহার্য বলে মনে করা হলেও অধিকারগুলির কোনোটিই সীমাহীন বা অবাধ নয়। ভারতীয় নাগরিকদের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাক্‌স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করার অধিকার ইত্যাদির মত মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, সদাচার প্রভৃতি শর্তের অধীন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংবিধান নিজেই বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্লামেন্টকে বিধি-নিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু, "প্রতিটি ক্ষেত্রে অধিকারগুলিই মৌলিক বলে বিবেচিত হবে, বিধি-নিষেধ গুলি নয়" ("But in every case it is the rights which are fundamental, not the limitations.")। কিন্তু এম. এম. সিং-এর মত অনেকের মতে, অধিকারগুলির মত বিধি-নিষেধ গুলিকেও মৌলিক বলে মনে করাই সমীচীন।

৬. আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচার রোধ:

আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের যথেচ্ছাচারের হাত থেকে রক্ষা করে নাগরিকদের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রের বা রাজ্যের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন সংবিধানের তৃতীয় অংশে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির বিরোধী হলে আদালত সেই আইন বাতিল করে দিয়ে অধিকারগুলির পবিত্রতা রক্ষা করে। উদাহরণ হিসেবে

মিনার্ভা মিলস্ মামলায় (1980) সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 1976 সালের 42'তম সংবিধান সংশোধনী আইনের 4 ও 55 নং ধারায় বলা হয় যে, নির্দেশমূলক নীতির যে কোনো একটি বা সবগুলিকে কার্যকর করতে গিয়ে কোনো আইন প্রণীত হলে আদালতে তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। মিনার্ভা মিলস্ মামলায় সুপ্রিমকোর্ট ওই দুটি ধারাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। এইভাবে মৌলিক অধিকারকে কেন্দ্র করে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সঙ্গে বিচার বিভাগের তীব্র বিরোধ শুরু হয়।

৭. কিছু অধিকার মৌলিক নয়:

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের যেসব মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা যায় না। উদাহরণ হিসেবে অস্পৃশ্যতা বর্জন (17 নং ধারা) কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ না করার (18 নং ধারা) কথা উল্লেখ করা যায়।

৮. জরুরি অবস্থায় অধিকারগুলি বলবৎযোগ্য নয়:

সাধারণ অবস্থায় আদালত মৌলিক অধিকার গুলিকে বলবৎ করে। কিন্তু দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারির মাধ্যমে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করার অধিকার বাতিল করে দিতে পারেন। তবে 44'তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, জরুরি অবস্থার সময়েও রাষ্ট্রপতি সংবিধানের 20 এবং 21 নং ধারা দুটিকে সাময়িক ভাবে হলেও বাতিল করতে পারবেন না।

৯. অর্থনৈতিক অধিকার সমূহের অনুপস্থিতি:

ভারতের সংবিধানে জনগণের অর্থনৈতিক অধিকার সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃতি প্রদান করে মূল ভারতীয় সংবিধান ভারতে বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। 44'তম সংবিধান সংশোধনের ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে মৌলিক অধিকারের কৌলীন্য হারালেও তা বিধিবদ্ধ আইনের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয় [300(A) নং ধারা]। তবে এরূপ সংবিধান সংশোধনের ফলেও ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

১০. ভোটাধিকার মৌলিক অধিকার নয়:

ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার সংবিধানের 326 নং ধারায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু ভোটাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারটিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বলে সংবিধান স্বীকৃতি প্রদান করেনি।

❖ ২.৬ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights of Indian Citizens):

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে 12 থেকে 35 ধারার মধ্যে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের মূল সংবিধানে সাত শ্রেণীর মৌলিক অধিকারের উল্লেখ ছিল। 1978 সালের 44'তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে সাধারণ আইনগত অধিকারে পরিণত হয়েছে এবং 300 (ক) ধারায় সংরক্ষিত আছে। এখন সংবিধানে নিম্নলিখিত ছয় প্রকার মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট আছে।

(১) সাম্যের অধিকার (Right to Equality) - (সংবিধানের 14 থেকে 18 ধারার মধ্যে সংরক্ষিত)।

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) - (সংবিধানের 19 থেকে 22 ধারার মধ্যে বিধিবদ্ধ)।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) - (সংবিধানের 23 ও 24 ধারায় আলোচিত)।

(৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) — (সংবিধানের 25 থেকে 28 ধারার মধ্যে উল্লিখিত)।

(৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights) - (সংবিধানের 29 ও 30 ধারায় লিপিবদ্ধ)। এবং

(৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies) - (সংবিধানের 32 ধারায় লিপিবদ্ধ) ।

❖ ২.৭ সাম্যের অধিকার (Right to Equality):

সাম্য বলতে বোঝায় ধনী-নির্ধন, অভিজাত-অভাজন, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি নির্বিশেষ প্রতিটি মানুষকে তার আত্মবিকাশের উপযোগী সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি (Harold Laski)-র মতে, সমাজের মধ্যে যদি বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা বর্তমান থাকে, তাহলে জনগণের কোনো রকম স্বাধীনতা থাকতে পারে না। তাই সাম্যের অধিকার আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতীয় সংবিধানের 14 থেকে 18 নং ধারায় সাম্যের অধিকার ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়েছে।

আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার:

14 নং ধারায় বলা হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' ('equality before the law') কিংবা 'আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত' ('equal protection of the laws') হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' কথাগুলি ব্রিটেনের সাধারণ আইন (common laws) থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ডাইসির 'আইনের অনুশাসন' ('rule of law) তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতিটি হল আইনের দৃষ্টিতে সমতা। 1960 সালে বিচারপতি সুব্বা রাও 'আইনের দৃষ্টিতে সমতাকে 'একটি নেতিবাচক ধারণা' ('a negative concept') বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কারণ, এই কথাটির অর্থ হল- কেউই বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা (special privilage) দাবি করতে পারে না এবং সব শ্রেণির নাগরিকই দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হবে। ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তি সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ আদালতের কাছে একই রকম বেআইনি কাজের জন্য সকলকেই সমানভাবে দায়ী থাকতে হয়। এ বিষয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ একজন কৃষকের কোনো পার্থক্য নেই। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আইভর জেনিংস (Ivor Jennings) বলেছেন যে, আইনের দৃষ্টিতে সমতা বলতে বোঝায় "সমকক্ষদের মধ্যে আইন সমান ও সমভাবে প্রযোজ্য হবে" ('among equals the law should be equal and should be equally administered') এবং 'একই ধরনের কাজের জন্য ('for the same. kind of action) সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক জাতি, সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্বিশেষে আদালতে অভিযোগ করতে বা অভিযুক্ত হতে পারবে। কবিন্দর সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন (1983) মামলায় সুপ্রিমকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় অনুযায়ী, আইনের অনুশাসন এই দাবি করে যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার চরম প্রয়োজনীয়তার সময়েও কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কঠোর, বর্বর কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণ' ('harsh, uncivilized or discreminatory treatment) করা চলবে না।

❐ ব্যতিক্রম:

ভারতে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' নীতির কতকগুলি ব্যতিক্রম (exception) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এগুলি হল-

(১) রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালরা পদাধিকারবলে যেসব ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য সম্পাদন করেন কিংবা তা করতে গিয়ে যেসব কার্য করেন, সেজন্য তাঁদের কোনো আদালতের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না।

(২) রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালরা যতদিন স্বপদে বহাল থাকেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না।

(৩) স্বপদে বহাল থাকাকালীন এঁদের গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত নির্দেশ দিতে পারে না।

(৪) এমনকি, স্বপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে সম্পাদিত ব্যক্তিগত কার্যাবলির জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা দায়ের করার জন্য 2 মাসের নোটিশ দিতে হয়।

(৫) বিদেশি রাষ্ট্রের শাসকদের এবং রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যায় না। কারণ, তাঁরা ভারতীয় আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নন।

(৬) যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রুপক্ষের ব্যক্তিরা ভারতীয় আদালতে মামলা রুজু করতে এবং অন্যান্য বন্দিদের মত সুযোগ সুবিধাও দাবি করতে পারে না।

(৭) পার্লামেন্ট এবং রাজ্য-আইনসভার সদস্যরা বেশ কয়েকটি 'বিশেষাধিকার' ('privileges') ভোগ করেন।

(৮) 88'তম সংবিধান সংশোধনী আইন (1978) অনুযায়ী পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রশাসনিক আদালত (Administrative Tribunal) গঠন করতে পারে। যে কোনো সরকারি কর্মচারী, স্থানীয় সংস্থা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দের চাকুরি সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব ট্রাইবিউনালের হাতে অর্পণ করা হয়। তা ছাড়া, শিল্প, ভূমিসংস্কার, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন প্রভৃতি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যও সংশ্লিষ্ট আইনসভা আইনের মাধ্যমে ট্রাইবিউনাল গঠন করতে পারে।

আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার:

সংবিধানের 14 নং ধারার দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া'র অধিকারটি মার্কিন সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনের 1 নং ধারা (Section-1) থেকে সংগৃহীত হয়েছে। 1960 সালে প্রদত্ত একটি মামলার রায়ে বিচারপতি সুব্বা রাও এই অধিকারটিকে 'একটি ইতিবাচক ধারণা' ('a positive concept') বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর মতে, আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া বলতে বোঝায়—সমান অবস্থায় সমপর্যায়ভুক্ত সব ব্যক্তির প্রতি আইন সমান আচরণ করবে এবং সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে। ভারতীয় সংবিধান বিশারদ দুর্গাদাস বসুও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

❐ **ব্যতিক্রম:**

আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকারের অর্থ এই নয় যে, অবস্থার বিচারবিশ্লেষণ না করে প্রতিটি আইন সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। যুক্তিসংগতভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে এবং প্রতিটি পৃথক ক্ষেত্রে আইন পৃথকভাবে প্রযুক্ত হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যাঁরাই আয় করেন, তাঁদের সবাইকে আয়কর প্রদান করতে হয় না। আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন হারে আয়কর প্রদান করতে হয়। তবে এই শ্রেণি বিভাজনের ভিত্তি যথার্থ ও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যে উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার যুক্তিসংগত সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সুতরাং যুক্তিসংগতভাবে আইনসভা বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রেণিবিভাজন করে আইন প্রণয়ন করলেও তা 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার' অধিকারকে খর্ব করে না। বোম্বাই রাজ্য বনাম এফ. এন. বালসারা (1951) মামলার রায়ে বিচারপতি ফজল আলি মন্তব্য করেছিলেন যে, এই নীতিটি রাষ্ট্রের হাত থেকে 'যুক্তিসংগত উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেণি বিভাজনের ক্ষমতা' ('the power of classifying persons for legitimate purpose') কেড়ে নেয়নি। অনুরূপভাবে, রামকৃষ্ণ ডালমিয়া বনাম তেন্ডুলকর (১৯৫৯) মামলার রায়ে

বিচারপতি গজেন্দ্রগাদকার বলেছিলেন যে, 14 নং ধারা 'শ্রেণিগত আইন প্রণয়ন' ('class legislation) নিষিদ্ধ করলেও যুক্তিসংগত শ্রেণিবিভাজনের জন্য আইন প্রণয়ন' নিষিদ্ধ করেনি। 'শ্রেণিগত আইন প্রণয়ন' বলতে সমাজের বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে এক শ্রেণির মানুষ" ('a class of persons')-কে খেয়ালখুশিমত বেছে নিয়ে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলকভাবে বিশেষ কতকগুলি সুযোগ সুবিধা তাদের প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করাকে বোঝায়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কোনো আইন যদি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, সেক্ষেত্রে আদালত সেই আইন বাতিল করে দিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে 1952 সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলি সরকার মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরূপ শ্রেণি বিভাজনের দুটি পূর্বশর্ত রয়েছে বলে বিচারপতি এস. আর. দাশ মন্তব্য করেছিলেন। সেগুলি হল- (১) শ্রেণিবিভাজনের নীতি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হবে এবং (২) শ্রেণি বিভাজনের সঙ্গে আইনের উদ্দেশ্যের যুক্তিসংগত সম্পর্ক বর্তমান থাকবে। সুতরাং বলা যায়, "আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া বলতে কেবল বৈষম্যমূলক আইনের হাত থেকে সংরক্ষণ করাকেই বোঝায় না, আইনের বৈষম্যমূলক প্রয়োগের হাত থেকেও সংরক্ষণকে বোঝায়। কোনো আইন কিংবা তার প্রয়োগ বৈষম্যমূলক কি না, তা বিচার করার দায়িত্ব আদালতের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এইভাবে সংবিধানের 14 নং ধারাটি ভারতে বিচারালয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে বলে কে.ভি. রাও প্রমুখ অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সাম্যের অধিকার তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তা ভারতীয় জনগণের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। কারণ, ধনী ব্যক্তিদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দরিদ্র জনসাধারণকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু মামলা চালাবার মত ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে ধনশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলায় অনেক সময় নির্দোষ দরিদ্র ব্যক্তিকে পরাজিত হতে হয়।

ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার বা বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ:

সংবিধানের 15(1) নং ধারায় নাগরিকদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, (১) কেবল ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। আবার, (২) উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল রেস্তোরাঁ ও প্রমোদস্থানে প্রবেশের এবং সরকারি অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত কিংবা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ ও জনসমাগমের স্থান ব্যবহারের অধিকার থেকে কোনো নাগরিককে বঞ্চিত করা যাবে না [15 (2) নং ধারা]।

❐ **ব্যতিক্রম:**

অবশ্য এই ধারারও কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে। সেগুলি হল: (১) জনস্বার্থে রাষ্ট্র কতকগুলি যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে, যেমন—জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্ণিত স্থানগুলিতে কোনো ছোঁয়াচে রোগীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারে। (২) নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম [15(3) নং ধারা]। (৩) সামাজিক এবং

শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরশ্রেণি এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতির নাগরিকদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম। [15(4) নং ধারা]। 2005 সালে 93'তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত নাগরিকদের কিংবা তপশিলি জাতি বা উপজাতিগুলির অগ্রগতির জন্য সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাদে) ভরতির ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারবে [15(5) নং ধারা]। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ সাম্যনীতির বিরোধী বলে বিবেচিত হয় না।

সরকারি চাকুরিতে সকলের সমানাধিকার:

সংবিধানের 16(1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারি চাকুরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে সব নাগরিকের সমান সুযোগসুবিধা থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, স্ত্রী-পুরুষ অথবা এর যে কোনো একটি কারণের জন্য কোনো নাগরিক সরকারি চাকুরি বা পদে নিয়োগের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না কিংবা তার প্রতি কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না [16(2) নং ধারা]। সরকারি চাকুরি বা পদে নিয়োগ ছাড়াও বেতন, পদোন্নতি, ছুটি, পেনশন প্রভৃতি বিষয়েও এই নিয়ম কার্যকর হবে। এই অধিকার কেবল সম্প্রদায়গত বৈষম্য (communal discrimination)-এর বিরুদ্ধেই নয়, সেই সঙ্গে স্থানীয় (local) অথবা স্ত্রীলোকদের (weaker sex) ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধেও রক্ষাকবচ (safeguard) হিসেবে কাজ করবে বলে দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন।

❐ **ব্যতিক্রম:**

তবে এই সমানাধিকারেরও কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। ব্যতিক্রমগুলি হল:

(১) পার্লামেন্ট যে কোনো অঙ্গরাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারি চাকুরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাসগত যোগ্যতাকে অন্যতম শর্ত হিসেবে আরোপ করতে পারে [16(3) নং ধারা]। কিন্তু কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোনো অংশের জন্য বসবাসগত যোগ্যতা স্থির করে দেওয়ার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই।

(২) প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্র অনুন্নত শ্রেণির নাগরিকদের জন্য কিছু সরকারি পদ বা চাকুরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে [16 (4) নং ধারা]।

(৩) সরকারি চাকুরিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতিগুলির যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব হয়নি বলে মনে করলে রাষ্ট্র ওইসব চাকুরিতে প্রবীণতার ভিত্তিতে এই দুটি জাতিভুক্ত কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য পদ সংরক্ষণ করতে সক্ষম [16(4) A]। 2000 সালের 81'তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে কোনো একটি বছরের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি পূরণ করা সম্ভব না হলে, পরবর্তী সময়ে ওই পদগুলিকে একটি স্বতন্ত্র ধরনের শূন্যপদ (a separate class of vacancies) বলে ধরা হবে। পরবর্তী যেকোনো বছরে সেই বছরের শূন্যপদ পূরণের সময় পূর্বোক্ত

শূন্যপদ পূরণ করা হলেও সেগুলিকে ওই বছরের শূন্যপদ হিসেবে ধরা হবে না। এইভাবে 50% পদ সংরক্ষণের বিধিটিকে মান্যতা দেওয়া হবে [16(4) b]।

(৪) কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চাকুরি সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে [16(5) নং ধারা]।

(৫) প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সরকার তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারে (335 নং ধারা)।

(৬) উপরিউক্ত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়াও মূল সংবিধানে আর একটি ব্যতিক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তা হল- ভারতের নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বে ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য কয়েকটি সরকারি পদ সংরক্ষিত রাখার যে ব্যবস্থা ছিল, তা 1960 সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হয় (366 নং ধারা)। 1960 সালের 25'শে জানুয়ারি থেকে এই বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন বা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অধিকার:

যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্যতা (untouchability) ভারতীয় সমাজজীবনে দুষ্ট ক্ষতের মত নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বাধীন ভারতের সমাজজীবন থেকে একে চিরদিনের জন্য মুছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধানের 17নং ধারায় অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা মূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ অস্পৃশ্য বলে কোনো ভারতীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হলে কিংবা অসম্মান করলে আইনগত শাস্তি পেতে হয়। সংবিধানের এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য 1955 সালে 'অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন' ['Untouchability (Offences) Act, 1995] প্রণীত হয়েছে। এই আইন অনুসারে 'অস্পৃশ্য' বলে কোনো ব্যক্তির হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কিংবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো দেবালয় অথবা দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, প্রমোদস্থান প্রভৃতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা অপরাধ বলে গণ্য হবে। তা ছাড়া, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাস্তাঘাট, জল-কল, জলাধার, শ্মশান, গোরস্থান ইত্যাদি ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও অস্পৃশ্য' বলে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

❐ **ব্যতিক্রম:**

ভারতের সংবিধানে বা অস্পৃশ্যতা সম্পর্কিত অপরাধ আইনে অস্পৃশ্যতার সঠিক অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা হয়নি। সংশ্লিষ্ট আইনে কতগুলি কাজকে অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সমস্ত কাজের জন্য আইনত শাস্তিপ্রদানের কথাও বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভারতের সমাজ ব্যবস্থা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হরিজন হত্যা বা নিগ্রহের ঘটনা ঘটে। অনেকের মতানুসারে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ সম্পর্কিত ধারণাটিকে চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক

নীতির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। তবে কেবলমাত্র আইনানুক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কেননা, এই সমস্যাটি একদিকে যেমন সামাজিক অন্যদিকে অর্থনৈতিকও বটে। তাই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক।

উপাধি গ্রহণ ও তার বিলোপ সাধন:

উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগুলি হল:

(১) সংবিধানের 18(1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সামরিক কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে গুণের স্বীকৃতি বিষয়ক উপাধি (title) ছাড়া রাষ্ট্র অন্য কোনো উপাধি প্রদান করবে না।

(২) কোনো ভারতীয় নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না [18 (2) নং ধারা]।

(৩) আবার, ভারত সরকারের কার্যে নিযুক্ত কোনো বিদেশি ব্যক্তি ভারতের রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমতিতে অন্য কোনো রাষ্ট্রের কাছ থেকে উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না [18 (3) নং ধারা]।

(৪) এমনকি, রাষ্ট্রীয় কার্যে নিযুক্ত বা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের উপহার, বেতন বা পদ গ্রহণ করতে পারবে না [18(4) নং ধারা]।

❐ **ব্যতিক্রম:**

উপাধি গ্রহণ ও বিলোপ সাধন সংক্রান্ত ব্যবস্থা সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও এর কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। ভারত সরকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করার ব্যবস্থা চালু করেছে। রাজা, মহারাজা, নবাব প্রভৃতির মত এগুলি উপাধি নয়; পুরস্কার বা সম্মানমাত্র। তা ছাড়া, রাষ্ট্র- প্রদত্ত সম্মানসূচক এইসব পুরস্কার যাঁরা লাভ করেন, তাঁরা নিজেদের নামের পাশে অথবা চিঠির মধ্যে এগুলির কোনো উল্লেখ করতে পারেন না।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানে ঘোষিত সাম্যের অধিকারকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না-হওয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাস্তবে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। বস্তুত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য ও বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়ে আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা বালির ওপর সৌধ নির্মাণের মতই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

❖ ২.৮ স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom):

স্বাধীনতার অধিকার হল একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের 19 থেকে 22 নং ধারায় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃতিলাভ করেছে।

ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকার:

বর্তমান সংবিধানের 19 (1) নং ধারায় নাগরিকদের 6 প্রকার স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে, যথা- (১) বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার; (২) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার ; (৩) সংঘ বা সমিতি কিংবা 'সমবায় সমিতি' (co-operative societies) গঠনের অধিকার ; (৪) ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করার অধিকার; (৫) ভারতের যে কোনো অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার এবং (৬) যে কোনো বৃত্তি, পেশা বা ব্যাবসা বাণিজ্য করার অধিকার।

মূল সংবিধানে 'সম্পত্তি দখল, অর্জন ও হস্তান্তর করার অধিকার' অন্যতম স্বাধীনতার অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু 1978 সালে 44'তম সংবিধান সংশোধনী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অংশ থেকে বাদ দেওয়ার ফলে বর্তমানে তা মৌলিক অধিকারের কৌলিন্য হারিয়ে বিধিবদ্ধ আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১. বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও তার নিয়ন্ত্রণ:

বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। ভারতের প্রতিটি নাগরিক নিজ ধ্যান-ধারণা ও বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে মতামত প্রকাশ করতে পারে। মতামত লিখিত বা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা যায়। চিঠি-পত্র, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা কিংবা সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে। আবার, সভাসমিতি, আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমেও মতামত প্রকাশিত হয়। সরকারের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করে সরকারকে সংযত থাকতে বাধ্য করার ব্যাপারে প্রচারমাধ্যমগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী কিংবা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর যেসব কারণে যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে, সেগুলি হল—(a) ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষা; (b) রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা; (c) বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সংরক্ষণ; (d) দেশে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা; (e) শালীনতা বা সদাচার (decency or morality) রক্ষা ; (f) আদালত অবমাননা প্রতিরোধ ; (g) মানহানি প্রতিরোধ এবং (h) অপরাধমূলক কার্যে প্ররোচনাদান বন্ধ করা [19 (2) নং ধারা]।

২. সমবেত হওয়ার অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ:

ভারতীয় নাগরিকদের সমবেত হওয়ার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য জনসমাবেশে সমবেত হওয়ার এবং শোভাযাত্রা করার অধিকার নাগরিকদের আছে। কিন্তু এই অধিকার 5 টি শর্তাধীনে ভোগ করা যেতে পারে। শর্তগুলি হল - (a) সভাসমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে হবে, (b) নাগরিকরা নিরস্ত্রভাবে সভাসমাবেশ করতে পারবে এবং (C) জনশৃঙ্খলার প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। তা ছাড়া, ষোড়শ সংবিধান

সংশোধনী (1963) আইনবলে রাষ্ট্র (d) ভারতের সার্বভৌমিকতা এবং (e) সংহতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনে নাগরিকদের এই অধিকারের ওপর 'যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে সক্ষম [19 (3) নং ধারা]।

৩. সংঘ বা সমিতি কিংবা 'সমবায় সমিতি' গঠনের অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ:

ভারতীয় নাগরিকদের সংঘ বা সমিতি কিংবা সমবায় সমিতি গঠনের অধিকার আছে। শ্রমিক সংঘ, ক্রীড়া সংঘ, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংঘ বা সমিতি কিংবা সমবায় সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি গঠন এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই অধিকারটি নিরঙ্কুশ নয়।

(a) বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নীতি-বিগর্হিত উদ্দেশ্যে গঠিত কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নকারী সংঘ বা সমিতিগুলির ওপর রাষ্ট্র যুক্তিসংগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

(b) তাছাড়া, ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষার প্রয়োজনেও রাষ্ট্র এই অধিকারটিকে সংকোচন করতে সক্ষম [19 (4) নং ধারা]। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধগুলি যুক্তিসংগত কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের হাতে অর্পিত হয়েছে।

৪. এবং ৫. যাতায়াত ও বসবাসের অধিকার এবং তাঁর সীমাবদ্ধতা:

ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে যাতায়াত করার এবং যে কোনো অঞ্চলে বসবাস করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কিন্তু (a) জনস্বার্থে এবং (b) তপশিলভুক্ত উপজাতিগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এই দুটি অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে [19 (5) নং ধারা]।

৬. বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের অধিকার এবং তার সীমাবদ্ধতা:

প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক নিজ পছন্দমত বৃত্তি, পেশা বা ব্যাবসা বাণিজ্য করার অধিকারী। কিন্তু জনস্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। (a) জনস্বার্থ বিরোধী যে কোনো ব্যাবসা-বাণিজ্যে সরকার হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। (b) তা ছাড়া, বিভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে কর্মীর যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে [19 (6) নং ধারা]। তবে স্বাধীনতার অধিকারের ওপর আইন কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধগুলি যুক্তিসংগত কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। কোনো আইন অযৌক্তিকভাবে বাধানিষেধ আরোপ করেছে বলে মনে করলে আদালত সংশ্লিষ্ট আইন বা তার যেকোনো অংশকে সংবিধান বিরোধী বলে বাতিল করে দিতে পারে।

দোষী সাব্যস্ত করা ও শাস্তিদান সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলি:

ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার যথার্থভাবে সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। **প্রথমত,** 20 (1) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রচলিত আইনভঙ্গের অপরাধ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং প্রচলিত আইনভঙ্গের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারেই শাস্তি প্রদান করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, যে অবস্থায় এবং যে সময়ে কোনো কাজকে অপরাধজনক বলে ঘোষণা করা হয়, সেই সময়ের প্রচলিত আইন অনুসারে অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত থাকার জন্য সেই অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হবে। কোনো নতুন আইন প্রণয়ন করে পূর্বে সম্পাদিত অপরাধের বিচার করা যায় না। **দ্বিতীয়ত,** কোনো ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাবে না [20 (2) নং ধারা]। এখানে শাস্তিপ্রদান' বলতে আইনভঙ্গের অপরাধে বিচারবিভাগ কর্তৃক শাস্তিবিধানের কথা বলা হয়েছে। কোনো আইন যদি একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তির ব্যবস্থা করে, তাহলে সেই আইন সংবিধানবিরোধী বলে বাতিল হয়ে যাবে। তবে কোনো সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারী আদালতে একবার শাস্তি পাওয়ার পরও যদি তার কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষের দ্বারা দ্বিতীয়বার শাস্তি লাভ করে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাজ সংবিধানবিরোধী বলে বিবেচিত হবে না। **তৃতীয়ত,** অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যায় না [20 (3) নং ধারা]।

জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার:

সংবিধানের 21 নং ধারায় বলা হয়েছে, 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' ('procedure established by law) ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতা (life or personal liberty) থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এর অর্থ হল— যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত আইনের সমর্থন লাভ করলেই কেবল শাসন বিভাগ নাগরিকদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। এইভাবে সংবিধানের 21 নং ধারাটি শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারী (arbitrary) বা বেআইনি (illegal) কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে রক্ষা করলেও এই ধারা আইন বিভাগের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয় না বলে দুর্গাদাস বসু অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ ও প্রকৃতি:

21 নং ধারায় বর্ণিত 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' এবং 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতির অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে এবং আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের সুপ্রিমকোর্ট প্রথমদিকে ব্যাপক অর্থে ব্যক্তিস্বাধীনতা কথাটি গ্রহণ করেনি। উদাহরণ হিসেবে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার (1950) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি (কেনিয়া, শাস্ত্রী, দাস ও মুখোপাধ্যায়) সংবিধানের 19 (1) (d) ধারাটিকে 21 নং ধারা থেকে পৃথকভাবে প্রয়োগ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, ভারতের যে কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করার অধিকারকে 21 নং ধারায় বর্ণিত ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের অধীন রেখে বিচার বিবেচনা করা যাবে না। পরবর্তী সময়ে সুপ্রিমকোর্ট কিছুটা ব্যাপক অর্থে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'

কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 1978 সালে মানেকা গন্ধি বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিমকোর্ট বলেছিল যে, ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার 19 নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলির সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়; বরং একটি অন্যটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের ক্ষেত্রে 21 নং ধারায় বর্ণিত আইন নির্দিষ্ট পদ্ধতির যৌক্তিকতা (reasonableness) বিচারের ক্ষমতা আদালতের রয়েছে।

আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির অর্থ ও প্রকৃতি:

ভারতের সংবিধানের প্রণেতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বর্ণিত 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি'র দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে জাপানি সংবিধানের 31 নং ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'র ব্যবস্থাকে সংবিধানে স্থান দেন। কিন্তু প্রশ্ন হল—'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' এবং 'আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি'র মধ্যে পার্থক্য কী? 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে মার্কিন সুপ্রিমকোর্ট কেবল আইনটি যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত হয়েছে কি না তাই বিচার করেন না, সেই সঙ্গে আইনটি 'স্বাভাবিক ন্যায়নীতিবোধ' ('principle of natural justice')-এর বিরোধী কি না তাও বিচার করে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো আইন ন্যায়সংগত বা যুক্তিসংগত কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রিমকোর্টের আছে।

অইননির্দিষ্ট পদ্ধতির অর্থ ও প্রকৃতি:

কিন্তু 'আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি' অনুসারে আদালত কোনো আইনের গুণাগুণ অর্থাৎ কোনো আইন ন্যায়-নীতিবোধের বিরোধী কি না, তা বিচার করতে পারে না। 'আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি' বলতে বোঝায়- যে আইন অনুসারে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে, সেই আইনটি বৈধ আইনসভা কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে প্রণীত কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের থাকবে। কিন্তু কোনো আইন স্বাভাবিক ন্যায় নীতিবোধ (Natural Justice)-এর বিরোধী কি না, তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের থাকে না। ভারতীয় সংবিধানের 21 নং ধারায় বর্ণিত 'আইননির্দিষ্ট পদ্ধতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় সুপ্রিমকোর্ট সংকীর্ণ অর্থে কথাগুলি প্রয়োগ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিল। এই মামলার রায়ে সুপ্রিমকোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি বলেছিলেন, সংবিধানের 21 নং ধারায় 'আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি' কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে আমাদের সংবিধান ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের 'যথাবিহিত পদ্ধতি' অনুসরণের পরিবর্তে 'ব্যক্তিস্বাধীনতা' সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণাকেই গ্রহণ করেছে। অন্যভাবে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধান আইন বিভাগের ওপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেও বিচার বিভাগের প্রাধান্যের পরিবর্তে পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতাকেই স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে, ভারতে কোনো ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে কি না, তা কেবল আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে দেখার ক্ষমতা আদালতের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। আইন কিংবা আইনগত পদ্ধতির যৌক্তিকতা বা গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আদালতের নেই বলে এ. কে. গোপালন মামলায় সুপ্রিমকোর্ট অভিমত ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু মানেকা গান্ধি মামলায় (1978)

সুপ্রিমকোর্ট এতখানি সংকীর্ণ অর্থে 'আইননির্দিষ্ট পদ্ধতির ধারণাটিকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। এই মামলার রায়ে সুপ্রিমকোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেছিল যে, 'আইননির্দিষ্ট পদ্ধতি'র যৌক্তিকতা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। এমনকি, সাম্প্রতিককালে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টগুলি বিভিন্ন জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলা (Public Interest Litigation - PIL)-র রায় দিতে গিয়ে কোনো আইন ন্যায়-নীতিবোধের বিরোধী কি না, তা ও বিচার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

শিক্ষার অধিকার:

2002 সালে 86'তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের মধ্যে 21-A নং ধারাটি সংযোজিত হয়। এই ধারায় শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র 6-14 বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (free and compulsory)-র ব্যবস্থা অবশ্যই করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উন্নিকৃষ্ণন বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় (1993) প্রদত্ত রায়ে সুপ্রিমকোর্ট শিক্ষার অধিকারকে জীবনের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন'। এই রায়দানের পর 1998 সালে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে রাজ্যসভায় 83'তম সংবিধান সংশোধন বিল পেশ করেছিল। এই বিলে 6- 14 বছর বয়স্কদের শিক্ষালাভের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য 21-A নং একটি ধারা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করার কথা বলা হয়। অনেক টালবাহানার পর বি. জে. পি.-র নেতৃত্বাধীন পূর্বতন জোট সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 93'তম সংবিধান সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করে এবং 2002 সালে তা 86'তম সংবিধান (সংশোধন) আইন হিসেবে গৃহীত হলে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা লাভ করে। এরপর 2009 সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক শিক্ষার অধিকার আইন' ('Right to Education Act, 2009') প্রণীত হয়। ওই আইনে 6 থেকে 14 বছর বয়স্ক বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে। 2010 সালের 1'লা এপ্রিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আইনটিকে কার্যকর করে এবং রাজ্যগুলিকেও কার্যকর করার নির্দেশ দেয়।

গ্রেফতার ও অটিক সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলি:

ভারতীয় সংবিধানের 22 নং ধারায় গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কিত ব্যবস্থাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, (১) কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার ও আটক করা হলে যথাসম্ভব সত্বর তাকে গ্রেফতার ও আটক করার কারণ জানাতে হবে। (২) আটক ব্যক্তিকে উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না [22(1) নং ধারা]। (৩) গ্রেফতার করার 24 ঘণ্টার মধ্যেই আটক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি ছাড়া তাকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোনোভাবেই আটক রাখা যাবে না [22 (2) নং ধারা]। কিন্তু (৪) শত্রুভাবাপন্ন বিদেশি (enemy alien) এবং (5) নিবর্তনমূলক আটক (preventive detention) আইনে ধৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এইসব নিয়ম প্রযোজ্য হবে না [22 (3) নং ধারা]।

নিবর্তনমূলক আটকের অর্থ ও প্রকৃতি:

'নিবর্তনমূলক আটক' বলতে বোঝায়— কোনো ব্যক্তি অপরাধমূলক কার্যে জড়িত রয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে বলে আশঙ্কা করে সরকার সেই ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক করতে পারে। নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে সরকারকে গ্রেফতার বা আটকের কারণ দর্শাতে কিংবা আদালতের সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থিত করতে হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত আছে কিংবা অপরাধ করতে পারে বলে সন্দেহ করা সত্ত্বেও সরকার তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না, তখন সেই ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে অপরাধমূলক কার্য থেকে বিরত করার জন্য সন্দেহবশে গ্রেফতার বা আটক করাকে 'নিবর্তনমূলক আটক' বলা হয় বলে দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন। ভারতের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় (foreign affairs), দেশের অথবা কোনো অঙ্গরাজ্যের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে পার্লামেন্ট এবং রাজ্য-আইনসভাগুলি নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংবিধানের 22(4) (7) নং উপধারাগুলি অনুসারে নিবর্তনমূলক আটক আইনের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে 3 মাসের বেশি আটক রাখা যাবে না। এই সময়ের বেশি আটক রাখতে হলে হাইকোর্টের কর্মরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা পর্ষদ (an Advisory Board)- এর অনুমতি প্রয়োজন। এরূপ আটকের সর্বাধিক মেয়াদ কী হবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের রয়েছে [22(7) নং ধারা]।

আটকের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ব্যবস্থা:

যাতে সরকারি কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছভাবে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ করতে না পারে, সেজন্য সংবিধানের 22(5) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আটকাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে যথাসম্ভব সত্বর আটক ব্যক্তিকে আটকের কারণ জানাতে হবে এবং আটকের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি আটক করার পেছনে যেসব তথ্য (facts) আছে, সেগুলিকে 'জনস্বার্থ' (public interest)-এর প্রয়োজনে প্রকাশ করা অনুচিত বলে মনে করে, তাহলে সেই কর্তৃপক্ষ আটক ব্যক্তিকে সেগুলি জানাতে বাধ্য নয় [22(6) নং ধারা]।

নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা:

সুতরাং বলা যায়, সংবিধানে 22(5) নং ধারা বলে নিবর্তনমূলক আটক আইনের দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে সে সংবিধানের 32 ও 226 নং ধারায় বর্ণিত 'বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ' (habeas corpus)-এর দাবিতে যথাক্রমে সুপ্রিমকোর্ট এবং হাইকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আদালত যেসব বিষয় বিচারবিবেচনা করে দেখতে পারে, সেগুলি হল- (১) যে আইন অনুসারে আটক করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, সেই আইনের বৈধতা (validity); (২) আইন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে আটক করা হয়েছে কি না; (৩) আটককারী কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যক্তিকে আটক করার যেসব

কারণ প্রদর্শন করেছে, সেগুলি যথাযথ এবং স্পষ্ট কি না; (৪) যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে আটককারী কর্তৃপক্ষ আটক ব্যক্তিকে প্রাথমিক (initial) অথবা অনুপূরক (supplementary) কারণ দেখিয়েছেন কি না এবং (৫) আটককারী কর্তৃপক্ষের আটক করার প্রকৃত ক্ষমতা (bonafide) আছে কি না। উপরিউক্ত বিষয়গুলি বিচারবিবেচনা করে আদালত সন্তুষ্ট হতে না পারলে আটক ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে।

বর্তমান ভারতে 'কোফেপোসা' ('COPEPOSA - Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974), 'নাসা' ('NASA' - National Security Act, 1980), 'এসমা' ('ESMA' - Essential Services Maintenance Act, 1981), 'বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) সংশোধনী আইন' ('UAPAA' Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act, 2008] প্রভৃতি আটক আইনের অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 2004 সালে ড. মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বাধীন সরকার 'সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ আইন' বা 'পোটা' ('POTA' - Prevention of | Terrorism Act, 2002) ও 'টাডা' [TADA' - Terrorist and Disruptive Activities (Prevention), Act, 1987 and its amendment in 1993) বাতিল করে দিয়েছে। তবে বহু বছর পূর্বে প্রণীত 'বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনটি [The Unlawful Activities (Prevention) Act) — UAPA] সংশোধিত হওয়ার ফলে এর মাধ্যমেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের মোকাবিলা করা সম্ভব বলে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে। এইসব আটক আইন ভারতীয় গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করেছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী 'নিবর্তনমূলক আটক' ব্যবস্থাকে সংবিধানের 'অশুভ বৈশিষ্ট্য' ('sinister looking feature'), ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ' ('a serious invasion on personal liberty') ইত্যাদি বলে সমালোচনা করেছেন। পরিশেষে, আমরা বিচারপতি মহাজন (Mahajan)-এর ভাষায় বলতে পারি, "নিবর্তনমূলক আটক আইনসমূহ গণতান্ত্রিক সংবিধানগুলির বিরোধী এবং বিশ্বের অন্য কোনো দেশে এগুলির অস্তিত্ব চোখে পড়ে না"।

❖ ২.৯ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation):

শোষণ, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু। ভারতীয় সংবিধানের 23 এবং 24 নং ধারায় নাগরিকদের শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটি স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মানুষ ক্রয়বিক্রয়, বেগার খাটানো ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ ও তার ব্যতিক্রম:

সংবিধানের 23 (1) নং ধারায় মানুষ নিয়ে ব্যবসা অর্থাৎ মানুষ ক্রয়বিক্রয়, বেগার খাটানো বা অনুরূপভাবে বলপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করা নিষিদ্ধ হয়েছে। মানুষ ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করা বলতে এখানে দাসপ্রথা (Slavery) ছাড়াও নারী, শিশু প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ছাড়া, বেগার খাটানোর মত যেকোনো ধরনের বলপূর্বক কাজ করানো ভারতীয় সংবিধানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এই অধিকারের ব্যতিক্রমও রয়েছে। (১) জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও শ্রেণি

নির্বিশেষে সবাইকে শ্রমদানে বাধ্য করতে পারে। (২) আবার, রাষ্ট্র যদি সামরিক শিক্ষাগ্রহণ কিংবা সমাজসেবামূলক কার্য সম্পাদনকে বাধ্যতামূলক বলে আইন প্রণয়ন করে, তবে সেই আইন সংবিধানের 23 (1) নং ধারার বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না।

সংবিধানের 24 নং ধারা অনুসারে, 14 বছরের কম বয়স্ক শিশুদের খনি, কারখানা ও অন্য কোনো বিপদজনক কার্যে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হয়েছে।

সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার স্বীকৃতি লাভ করলেও ভারতে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং, উৎপাদনের উপাদানগুলির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকায় মালিকশ্রেণি অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য শ্রমিকশ্রেণিকে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করে নির্দয়ভাবে শোষণ করছে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের নেতিবাচক ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুতরাং বলা যায়, কেবল সংবিধানে বলপূর্বক শ্রমদান নিষিদ্ধ করে কিংবা বেগার প্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন উৎপাদনের উপাদানগুলির ওপর সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা।

❖ ২.১০ ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion):

হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পারসি প্রভৃতি ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে ভারতে বসবাস করছে। ব্রিটিশরা ভারতকে নিজেদের পদানত রেখে শোষণ করার জন্য 'বিভক্ত করে শাসন করো' ('Divide and Rule') নীতি অনুসরণ করেছিল। ফলে হিন্দু-মুসলমান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনে বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায় এবং শেষপর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করলে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয় ; জন্মলাভ করে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। কিন্তু পাকিস্তান ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও ভারত 'ধর্মনিরপেক্ষ' (secular') রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অর্থ:

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও মূল সংবিধানের কোথাও ভারতকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র বলে বর্ণনা করা হয়নি। 1976 সালে 42'তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটি সংযোজন করা হয়েছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়, তা বলতে গিয়ে অনন্তসায়নম্ আয়েঙ্গার (Anantsayanam Ayyangar) গণপরিষদে মন্তব্য করেছিলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলতে একথা বোঝায় না যে, কোনো ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। 'ধর্মনিরপেক্ষ' কথাটির অর্থ হল- রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে সাহায্য করবে না বা এক ধর্ম অপেক্ষা অন্য ধর্মকে প্রাধান্য দেবে না। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সব ধর্মকে সমান মর্যাদা প্রদান করাকে বোঝায়। রাধাকৃষ্ণণ (Radhakrishnan)-এর মতে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে অধার্মিক (irreligious), ধর্ম-বিরোধী (anti- religious) কিংবা ধর্ম বিষয়ে উদাসীন (indifferent to religion) রাষ্ট্রকে বোঝায় না। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল এমন একটি রাষ্ট্র, যা ব্যক্তি ও ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠানগুলির ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে, যা ধর্মীয় মতামত নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে নাগরিক হিসেবে গণ্য করে এবং যা সাংবিধানিকভাবে বিশেষ কোনো ধর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে না কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বা বিরোধিতা করে না। এক কথায় বলা যায়, ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ:

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটিভাবে ভারতে বর্তমান রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের 25 থেকে 28 নং ধারায় জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার, ধর্মপালন ও ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতা রয়েছে [25 (1) নং ধারা]। সাধারণভাবে রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় বিষয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করতে না পারলেও (১) জনশৃঙ্খলা, সমাজের স্বীকৃত নীতিবোধ, জনস্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। (২) বিশেষ কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোনো ধর্মাচরণের অঙ্গ কি না, তা বিচারবিবেচনা করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। বস্তুত, ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জনস্বার্থ প্রভৃতি বিঘ্নিত হলে কিংবা নরবলির মত অমানবিক কার্যাবলি অনুষ্ঠিত হলে অথবা সতীদাহ, দেবদাসী প্রথার মত নীতি-বিগর্হিত আচার-অনুষ্ঠান চলতে থাকলে সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। তাই, এসব প্রতিরোধ করার জন্য সংগত কারণে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একান্তভাবে প্রয়োজন। (৩) সংবিধানে একথাও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ধর্মাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক (economic), আর্থিক (financial), রাজনৈতিক (political) কিংবা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (৪) সামাজিক কল্যাণসাধন ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। (৫) এমনকি, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী সব ব্যক্তির কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংবিধানে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও হলেন 'হিন্দু'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংবিধানের 19 (1) (b) নং ধারায় নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার কথা বলা হলেও শিখ ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে কৃপাণ ধারণ ও বহনের অধিকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। কারণ, কৃপাণ ধারণ ও বহন শিখ ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ:

ব্যক্তি ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সংবিধানে কতকগুলি অধিকার প্রদান করা হয়েছে। 26 নং ধারা অনুসারে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার যে কোনো অংশ (১) ধর্ম বা দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে ; (2) নিজ নিজ ধর্ম বিষয়ক কার্যকলাপ নিজেরাই পরিচালনা করতে; (৩) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ভোগদখল করতে এবং (৪) আইন অনুসারে সম্পত্তি

পরিচালনা করতে পারবে। তবে রাষ্ট্র (a) জনশৃঙ্খলা, (b) নৈতিকতা ও (c) জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য যে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার অংশের উপরিউক্ত অধিকারগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে।

ধর্মীয় উদ্দেশ্যে কর আদায় নিষিদ্ধকরণ:

কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রসার বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর প্রদানে বাধ্য করা যায় না (27 নং ধারা)। কিন্তু মন্দির দর্শন, দেবপূজা ইত্যাদি ব্যাপারে রাষ্ট্র কর ধার্য করার পরিবর্তে বৃত্তি বা অনুদান (fee) ধার্য করে সংবিধানের এই বাধানিষেধটিকে এড়িয়ে যেতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষাদান নিষিদ্ধকরণ:

ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মীয় শিক্ষাদানের ওপর কিছু কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। 28 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, (১) সম্পূর্ণভাবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাদান করা যাবে না। (২) আবার, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিংবা সরকারি অর্থে আংশিকভাবে পরিচালিত, সেগুলিতেও শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যাবে না। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হলেও কোনো দাতা বা অছি (trust)-র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা দেওয়া যায়, যদি দাতার উইলে কোনো বিশেষ ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ থাকে।

পরিশেষে মন্তব্য করা যেতে পারে যে, নাগরিক ও বিদেশি নির্বিশেষে সব ব্যক্তিকেই ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ভয়াবহ আকার ধারণ করার ফলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র চরম সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি- বাবরি মসজিদ বিরোধকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠনগুলি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মেতে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত 1992 সালের 6'ই ডিসেম্বর তথাকথিত 'করসেবা'র নাম করে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বাবরি মসজিদটিকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করে দেয়। 1998 সালে গুজরাটে খ্রিস্টানদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ চালানো ও গির্জাতে অগ্নিসংযোগ করা, ওড়িশার কেওনঝোড়ে দুই শিশুপুত্র- সহ খ্রিস্টান মিশনারি গ্রাহাম স্টেইনসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা এবং 2002 সালে গুজরাটে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে কার্যত সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা, সবরমতী আশ্রমে অনুষ্ঠিত শান্তি সমাবেশের ওপর হামলা চালিয়ে নর্মদা আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকর সহ সাংবাদিকদের নিগ্রহ করা, 2009 সালে ওড়িশার কন্ধমালে 43 জন খ্রিস্টানের প্রাণনাশ ও নুয়াগাঁও ব্লকে অবস্থিত দিব্যজ্যোতি প্যাস্টল সেন্টার নামক উপাসনাগৃহটিতে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি হল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের নিদর্শন। এমতাবস্থায় সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে; অন্যথায় ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

আকাশ সাম্প্রদায়িকতারূপী কালনাগিনির বিষবাষ্পে ভরে উঠবে। আমাদের মহান ভারত ধর্ম ব্যবসায়ীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হবে।

❖ ২.১১ সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Rights):

গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হল সুচিন্তিত ও সুগঠিত জনমত। জনগণ যদি অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন থাকে, তবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে না। আর, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ না ঘটলে গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। ভারতীয় সংবিধানের 29 এবং 30 নং ধারায় সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার ঘোষিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, (১) সব শ্রেণির নাগরিক নিজ নিজ ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার অধিকারী। এই অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। (২) তা ছাড়া, রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত অথবা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে কোনো ব্যক্তিকে ধর্ম, বংশ, জাতি বা ভাষার অজুহাতে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রবেশাধিকারের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি নিজেদের পছন্দমত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারে। এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাহায্য প্রদানের বিষয়ে রাষ্ট্র কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। এরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত রাখা যাবে না। এই কারণে মাদ্রাজ (বর্তমান তামিলনাড়ু) সরকারি কলেজে ধর্মের ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাটি সংবিধান বিরোধী বলে বাতিল হয়ে যায়। (৩) আবার, রাষ্ট্র সংখ্যালঘু শ্রেণির কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে চাইলে তাকে পুরো ক্ষতিপূরণ (full compensation) প্রদান করতে হবে [30 (1-a) নং ধারা]।

❖ ২.১২ সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার বা আদেশ, নির্দেশ ও লেখজারির অধিকার (Right to Constitutional Remedies):

সংবিধানে কেবল লিপিবদ্ধ করা হলেই যে মৌলিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত হবে, এমন কোনো কথা নেই। আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ প্রভৃতি যে কোনো সময়ে অধিকারগুলি খর্ব করতে পারে। তাই সাংবিধানিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে অধিকারগুলি সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একান্ত অপরিহার্য। ড. আম্বেদকর 32 নং ধারায় বর্ণিত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারকে 'সংবিধানের আত্মা ও প্রাণকেন্দ্র' ('the very soul of the constitution and the very heart of it') বলে বর্ণনা করেছিলেন।

আদেশ বা নির্দেশ জারি করে অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা:

ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার সংবিধানের 32 ও 226 নং ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 32 নং ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ ও কার্যকর করার জন্য নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট এই অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার-পৃচ্ছা এবং উৎপ্রেষণ প্রভৃতি লেখ (Writ), নির্দেশ (Direction) বা আদেশ (Order) জারি করতে পারে।

অনুরূপভাবে, 226 নং ধারা অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলির হাইকোর্ট আদেশ বা নির্দেশ জারি করে অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। তা ছাড়া, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট ছাড়া অন্য যে কোনো আদালতকে নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে পূর্বোক্ত লেখসমূহ জারি করার ক্ষমতা প্রদান করতে পারে। তবে অদ্যাবধি পার্লামেন্ট এই ধরনের কোনো আইন প্রণয়ন করেনি।

আদেশ, নির্দেশ বা লেখ-

সংবিধানে উল্লিখিত আদেশ, নির্দেশ বা লেখগুলি হল- (১) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, (২) পরমাদেশ, (৩) প্রতিষেধ, (৪) অধিকার-পৃচ্ছা এবং (৫) উৎপ্রেষণ।

১. বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus):

বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ কথাটির অর্থ বন্দিকে আদালতে সশরীরে হাজির করা। কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে কী কারণে তাকে আটক করা হয়েছে, তা জানার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট বন্দির আবেদনক্রমে আটককারীর ওপর আদেশ জারি করে বন্দিকে আদালতকক্ষে উপস্থিত করার নির্দেশ দিতে পারে। আদালত যদি মনে করে যে, বেআইনিভাবে আবেদনকারীকে আটক করা হয়েছে, তবে আটক ব্যক্তিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সুপ্রিমকোর্ট কেবল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 'বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ' লেখ জারি করতে সক্ষম। কিন্তু হাইকোর্ট রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি (individual) উভয়ের বিরুদ্ধেই এই লেখ জারি করার অধিকারী। তবে দুটি ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ' লেখ জারি করতে পারে না, যথা- (a) নিজ এক্তিয়ারের বাইরে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে আদালত এরূপ লেখ জারি করতে অক্ষম এবং (b) ফৌজদারি অপরাধের জন্য কোনো আদালত কর্তৃক হাজতবাসের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুক্তির উদ্দেশ্যে সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ' লেখ জারি করার অধিকারী নয়।

২. পরমাদেশ (Mandamus):

পরমাদেশ শব্দটির অর্থ 'আমরা আদেশ দিচ্ছি' ('We order')। সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট কোনো অধস্তন আদালত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য পরমাদেশ জারি করতে পারে। এই আদেশ জারি করে আদালত সরকারকে আইনসংগত ও জনস্বার্থ সম্পর্কিত কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য করে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি কিংবা কোনো রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে পরমাদেশ জারি করার ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্টের নেই।

৩. প্রতিষেধ (Prohibition):

প্রতিষেধ কথাটির অর্থ 'নিষেধ করা'। এই আদেশ জারি করে ঊর্ধ্বতন আদালত নিম্নতন আদালতকে তাদের এক্তিয়ার বহির্ভূত কার্য সম্পাদনে বাধা দিতে পারে। ঊর্ধ্বতন

আদালতের এই নির্দেশ লঙ্ঘন করা হলে লঙ্ঘনকারীকে আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

৪. অধিকার পৃচ্ছা (Quo-Warranto):

অধিকার পৃচ্ছার অর্থ 'কোন্ অধিকারে'। কোনো ব্যক্তি যে পদ অধিকার করে থাকে সেই পদের জন্য তার দাবি কতখানি যুক্তিসংগত, তা সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট অধিকার পৃচ্ছার মাধ্যমে খতিয়ে দেখে। দাবিটি অবৈধ বলে মনে করলে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দিতে পারে।

৫. উৎপ্রেষণ (Certlorari):

উৎপ্রেষণ বলতে 'বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া'-কে বোঝায়। সুপ্রিমকোর্ট বা হাইকোর্ট কোনো মামলার নিরপেক্ষ বিচার করার জন্য কিংবা অধস্তন আদালতগুলির ক্ষমতা বহির্ভূত কার্যে বাধাদানের উদ্দেশ্যে তাদের এই নির্দেশ দিতে পারে যে, মামলাটি তদানির জন্য উচ্চ আদালতে প্রেরণ করা হোক। এরূপ আদেশ পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে।

❐ ব্যতিক্রমসমূহ:

সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মত সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারটিও অবাধ বা নিরঙ্কুশ নয়। এই অধিকারের ব্যতিক্রমগুলি হল:

(১) যুদ্ধ কিংবা বহিরাক্রমণের ফলে সমগ্র দেশ বা তার কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এরূপ জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে সংবিধানের 19 নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলি অকার্যকর হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আইনসভা যে কোনো আইন প্রণয়ন করতে এবং শাসন বিভাগ যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে [358 (1) নং ধারা]।

(২) তাছাড়া, জরুরি অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতি আদেশ জারি করে কেবল 20 ও 21 নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি ছাড়া অন্যান্য মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করার জন্য আদালতে আবেদন করার অধিকার স্থগিত রাখতে পারেন [359 (1) নং ধারা]।

(৩) সশস্ত্র বাহিনীর অথবা জনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত অন্যান্য বাহিনীর কিংবা গোয়েন্দা ব্যুরো বা এই ধরনের অন্য সংগঠনের প্রয়োজনে নিযুক্ত টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার কর্মীদের কর্তব্য সম্পাদন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সুনিশ্চিত করার জন্য তারা কতখানি মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তা স্থির করে দিতে পারে [33 (a) (d) নং ধারা]।

(৪) ভারতের কোনো অঞ্চলে সামরিক শাসন চালু থাকাকালীন কোনো সরকারি কর্মচারী বা অন্য কেউ শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কোনো অবৈধ কাজ করলে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে ওইসব কাজকে বৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে (34 নং ধারা)। পার্লামেন্ট প্রণীত এরূপ আইনকে 'দণ্ডনিষ্কৃতি আইন' ('Indemnity Act') বলা হয়।

❖ ২.১৩ ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত মৌলিক অধিকার গুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য (Importance and Significance of Fundamental Rights mentioned in Constitution of India):

ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায়।

(১) ভারতে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(২) মৌলিক অধিকারসমূহ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণের অনুপন্থী এক ব্যাপক কর্মকাণ্ড।

(৩) মৌলিক অধিকার সরকারের অবাধ ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতার নিগড় নিশ্চিত করে।

(৪) ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম মেরুদণ্ড হিসাবে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়।

(৫) সামাজিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তি হিসাবে মৌলিক অধিকারসমূহের অস্তিত্ব বিশেষভাবে অর্থবহ।

(৬) মৌলিক অধিকারসমূহ রাজনীতিক এবং প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের অংশগ্রহণকে সহজ ও স্বাভাবিক করে।

(৭) মানুষের জাগতিক ও নৈতিক নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারসমূহ সদর্থক ভূমিকা পালন করে।

(৮) মানুষের মর্যাদা ও সম্মান সংরক্ষণে মৌলিক অধিকারসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ চেহারা-চরিত্র নিশ্চিত ও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারসমূহ অপরিহার্য পরিগণিত হয়।

(১০) সমাজের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং পিছড়ে বর্গের স্বার্থ সংরক্ষণে মৌলিক অধিকারসমূহের ভূমিকার গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

❖ ২.১৪ আইনের অনুশাসন (Rule of Law):

আইনের অনুশাসন হল একটি রাজনৈতিক আদর্শ, যে আদর্শের প্রতি রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক, প্রতিষ্ঠান, আইন প্রণেতা, রাজনৈতিক নেত্রীবর্গ সকলেই দায়বদ্ধ। আইনের অনুশাসন শব্দটি সাংবিধানিকতা ও আইনের রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। আরও বলা যায় যে, আইনের অনুশাসন হল একটি প্রক্রিয়া,

প্রতিষ্ঠান, অনুশীলন বা আদর্শ যা আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমত্বকে সমর্থন করে। সরকারের ও স্বেচ্ছাচারী রূপকে সুনিশ্চিত করে এবং ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আইনের অনুশাসনের ধারণা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী রয়েছে।

❖ ২.১৫ আইনের অনুশাসনের ধারণার অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Rule of Law):

আইনের অনুশাসন শব্দটি নিজেই বোঝায়, আইনের অনুশাসন মানে আইনের শাসন, ব্যক্তির নয়। 'আইনের অনুশাসন' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে ফরাসি শব্দগুচ্ছ 'le principe de legalite' থেকে, যার অর্থ বৈধতার নীতি।

সাধারণভাবে আইনের অনুশাসন বলতে আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্যকে বোঝায়। আইনের অনুশাসনের ধারণা অনুযায়ী আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে। আইনের অনুশাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে প্রফেসর ওয়েড (Wade) বলেছেন যে, আইনের অনুশাসন অনুযায়ী সরকারকে আইনের অধীন হতে হবে, আইনকে সরকারের অধীন নয়। ব্ল্যাকের(Black) আইন অভিধান অনুসারে, আইনের অনুশাসনকে আইনের অধিপত্য হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যেখানে পরিচিত নীতি বা আইন প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এই ধরনের নীতি বা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

আবার আইনের শাসনকে অনেক পন্ডিত চূড়ান্ত কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যা কোনো মানুষ অগ্রাহ্য করতে পারে না। আইনের শাসন সংবিধানের অন্যতম মৌলিক ও সাধারণ নীতি। মাক্স ওয়েবারের ভাষায় এটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে আইনি আধিপত্য ব্যক্তির খামখেয়ালি চেয়ে আইনের সরকারের ধারণার হিসাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আমরা বলতে পারি আইনের অনুশাসন মানে সরকার থেকে তার কর্মকর্তা ও নাগরিকসহ সকলের আইন অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

অনেকে আবার আইনের অনুশাসন মতবাদকে আইনের অধিপত্য বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যেখানে আইনের শাসন আছে সেখানে কোনো ব্যক্তিকে আইনের উর্ধ্বে বলা যাবে না, এমনকি রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গের কাজ ও কর্মকান্ডও আইনের আওতার মধ্যে থাকবে। আইনের অনুশাসন সংসদীয় গণতন্ত্রে সকল নাগরিকের উপর আইনের আনুগত্য করার জন্য একটি কর্তব্য আরোপ করে এবং এই ধরনের আনুগত্যের জন্য আইনটিকে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে হবে এবং স্বেচ্ছাচারী বা নিপীড়নমূলক আইন হলে চলবে না। অন্যান্য সংবিধানিক নীতির মত আইনের অনুশাসনের লক্ষ্যও হচ্ছে জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের উন্নয়ন।

❖ ২.১৬ আইনের অনুশাসনের উৎপত্তি (Origin of the Lule of Law):

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলকে আইনের অনুশাসন মতবাদের প্রাচীন প্রবক্তা বলে মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ প্লেটো তার 'Complete Works of Plato' বইতে লিখেছেন যে, রাষ্ট্রের পতন খুব বেশি দূরে নয় যেখানে আইনকে কর্তৃপক্ষের বিষয়বস্তু করা হয়। তবে যেখানে আইনকে সর্বোত্তম আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেখানে রাষ্ট্রগুলি সর্বদা বিকাশ লাভ করে। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে আইনকে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্নিহিত একটি ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

ইংল্যান্ডে আইনের অনুশাসন 1215 সালের দিকে শুরু হয়েছিল, যখন ইংল্যান্ডের রাজা জন 1215 সালে 'Magna Carta'-তে স্বাক্ষর করেছিলেন। ইংল্যান্ডে আইনের অনুশাসনের মতবাদটি পার্লামেন্ট এবং রাজতন্ত্র বা রাজার মধ্যে দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নতুন রূপ নেয়। এই দ্বন্দ্ব সংসদ ও রাজতন্ত্র, কে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী সেই বিষয়ে সংগঠিত হয়েছিল। সংসদ বা পার্লামেন্ট এই দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে। পার্লামেন্ট রাজতন্ত্রের উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়ার পর এটি আইন প্রণয়ন করতে শুরু করে এবং এটাই ছিল ইংল্যান্ডে আইনের অনুশাসনের সূচনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের অনুশাসনের মতবাদ প্রথম 1776 সালে পেইন (Paine) নামে পরিচিত সাংবিধানিক আইনজীবীদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। তারা মনে করেন যে, আমেরিকা একটি মুক্ত দেশ হিসেবে আইনকে বিবেচনা করে। কারণ, যে দেশে স্বাধীন আইন রয়েছে সেখানে আইনেরই প্রাধান্য হওয়া উচিত, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের নয়।

আইনের অনুশাসনের ধারণাকে আরও বিকশিত করেছিলেন এ. ভি. ডাইসি (Albert Venn Dicey) নামে বিখ্যাত ইংরেজ সাংবিধানিক আইনজীবি। তিনি প্রথম আধুনিক অর্থে আইনের অনুশাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তার 'Introduction to the Study of the law of the Constitution' (১৮৮৫) বইতে বলেছেন, সরকারের সমস্ত দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং কার্যাবলী এর অঙ্গ ও কর্তৃপক্ষ সহ আইন অনুসারে সম্পন্ন হয়।

❖ ২.১৭ ডাইসির আইনের অনুশাসনের ধারণা (Dicey'sConcept of Rule of Law):

অধ্যাপক ডাইসি সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধ ভাবে আইনের অনুশাসনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেন। তিনি আইনের অনুশাসনের প্রধান তিনটি নীতির কথা বলেছেন: (১) আইনের আধিপত্য (Supremacy of Law) (2) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য (Equality before law) (৩) আইনি চেতনার প্রাধান্য (Predominance of Legal Spirit)।এই নীতিগুলি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল:

(১) আইনের আধিপত্য (Supremacy of Law):

সুস্পষ্ট আইন লঙ্ঘনের অভিযোগের ভিত্তিতে সাধারণ আদালতে সাধারণ আইনগত পদ্ধতিতে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না বা তাকে তার জীবন ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ডাইসি বলেছেন : "...no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of law." এর দ্বারা সাধারণ আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। সকল নাগরিক একমাত্র সাধারণ আইনের কাছেই দায়ী। সাধারণ আইন ও সাধারণ আদালতকে এড়িয়ে কোনো নাগরিককে শাস্তি দেওয়ার কোনো বিশেষ ক্ষমতা (prerogative), স্বৈরী ক্ষমতা (arbitrary power) বা স্বেচ্ছাধীন

ক্ষমতা (discretionary power) সরকারের নেই। রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ আইনের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হলে সাধারণ আইন ও সাধারণ আদালতের মাধ্যমেই দিতে হবে।

(2) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য (Equality before Law):

আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। কোনো ব্যক্তি আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সামাজিক অবস্থা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলেই দেশের সাধারণ আইন ও সাধারণ আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত। সাধারণ নাগরিকের মত সরকার বা শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণও একই আইনের অধীন। আইন অমান্যের অভিযোগে তাঁরাও সমানভাবে দণ্ডনীয়। ডাইসি বলেছেন: "....no man is above the law, ...every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals." আইনের দৃষ্টিতে একজন নাগরিক ও একজন সরকারী কর্মচারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও সাধারণ অবস্থা নির্বিশেষে সকলেই দেশের সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ আদালতের কাছে দায়িত্বশীল।

(৩) আইনি চেতনার প্রাধান্য (Predominance of Legal Spirit):

আইনের অনুশাসন সম্পর্কে ডাইসির ধারণার তৃতীয় নীতিটি হল আইনি চেতনার প্রাধান্য। এখানে আইনের অনুশাসনের চেতনাকে কার্যকর করার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আদালত আইনের শাসনের রক্ষক এবং তাই এটিকে নিরপেক্ষতা ও বহিরাগত প্রভাব মুক্ত হতে হবে। কেননা, শুধুমাত্র প্রথম দুটি নীতি কোনো দেশে কার্যকরী থাকলেই হবে না, নীতিগুলিকে রক্ষা ও বজায় রাখার জন্য একটি কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে। আর আদালত হল সেই কর্তৃপক্ষ। ডাইসির, মতে ব্রিটেনে কোনো লিখিত সংবিধান নেই, ব্রিটেনে দীর্ঘকাল ধরে আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নাগরিকদের বহু অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই সমস্ত অধিকারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক আইন।

অধ্যাপক ডাইসির আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটি বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচকরা সমালোচনা করেছেন। আধুনিক কালের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে ডাইসির আইনের অনুশাসনের ধারণা সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সাম্প্রতিককালে অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন ও শাসন বিভাগীয় কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটেছে। তার ফলে আইনের অনুশাসনের অর্থ বহুলাংশে সীমিত হয়ে পড়েছে। তবে আইনের অনুশাসনের নীতিকে পুরোপুরি উপেক্ষা বা বাতিল করা যায় না। কেননা, সরকারের কোনো আইন বহির্ভূত ক্ষমতা থাকতে পারে না, আর যদি থাকে তার সমর্থনও করা যায় না।

❖ ২.১৮ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে আইনের অনুশাসনের ধারণা (Concept of Rule of Law in Indian Context):

ভারতীয় সংবিধানে আইনের অনুশাসনের কোনো নির্দিষ্ট উল্লেখ নেই, যদিও ভারতীয় আদালত গুলি তাদের বিভিন্ন রায়ে আইনের অনুশাসনের ধারণাটি উল্লেখ করে। ভারতের সাধারণ নাগরিক থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত প্রত্যেকেই আইনের অধীন এবং আইন অমান্য করলে প্রত্যেককেই শাস্তি পেতে হয়। ভারতীয় সংবিধান আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের উপরে প্রাধান্য পায়। কেননা, সরকারের এই তিনটি বিভাগকেই সংবিধান অনুযায়ী তাদের কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। আর সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। তাই ভারতেও আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এ কথা আমরা বলতে পারি।

ভারতীয় সংবিধানে আইনের অনুশাসনের ধারণাটি সরাসরি বলা না থাকলেও অনেক ধারা রয়েছে যেখানে আইনের অনুশাসনের ধারণার বাস্তবায়ন ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সাম্য, স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার অর্জনের উদ্দেশ্য ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতের সংবিধানের 14 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং আইন দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকারের কথা। অর্থাৎ এই ধারা অনুযায়ী ভারতের প্রত্যেক নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং কোনো নাগরিককে রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের সমান সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এই শব্দগুলির অর্থ হল যে, আইন সর্বোত্তম এবং এখানে স্বেচ্ছাচারিতার কোনো সুযোগ নেই। কেননা প্রত্যেকেই আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত হয়। আইন কোনো পক্ষপাত ছাড়াই সকলের সাথে সমান আচরণ করে, যা আইনের অনুশাসনের জন্য মৌলিক প্রয়োজন বলে গণ্য হয়। ভারতীয় সংবিধানের 15 নম্বর ধারা 16 নম্বর ধারা এবং 23 নাম্বার ধারাতেও আইনের অনুশাসনের ধারণা সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে কার্যকরী রয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের 13 নং ধারা হল আরেকটি উদাহরণ যা ভারতে আইনের অনুশাসনের মতবাদকে সমর্থন করে। এই ধারায় বিধি, প্র-বিধান, উপ আইন এবং অধ্যাদেশ হিসাবে সংজ্ঞায়িত আইন গুলি যদি ভারতের সংবিধানের বিরোধী হয় তবে তা বাতিল করা যেতে পারে এ কথা বলা হয়েছে। কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আইনের শাসনকে সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই ক্ষেত্রে যদিও সুপ্রিম কোর্ট পার্লামেন্টের সংশোধনী ক্ষমতাকে বহাল রেখেছে যা সংবিধানের অধীনে প্রদত্ত প্রতিটি অনুচ্ছেদে প্রসারিত; কিন্তু সেই ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন পার্লামেন্ট করতে পারবে না।

মৌলিক অধিকার হল সার্বজনীন এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এই ধরনের মৌলিক অধিকার শুধুমাত্র সেই রাষ্ট্র দ্বারা সুরক্ষিত হতে পারে যারা আইনের শাসনকে সম্মান করে। ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের অধীনে নাগরিকদের জন্য ছয়টি মৌলিক অধিকারের বর্ণনা রয়েছে। যে অধিকার গুলি চাইলেই বাতিল করা যায় না। সংবিধানের 32 নম্বর ধারা অনুসারে এই অধিকার গুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় বর্ণিত এই অধিকার গুলি ভারতে আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত করে বলে অনেকেই মনে করেন।

ভারতে আইনের অনুশাসনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল- বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা আইনের অনুশাসনের একটি অপরিহার্য অংশ। এটি কেবল সংবিধানিক নীতি গুলিকে রক্ষা করে না বরং প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপ এবং এর বৈধতা ও পরীক্ষা করে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং আমলাতন্ত্রের সমস্ত কর্মচারীই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার সাপেক্ষে এবং তাদের কর্মের যৌক্তিকতার জন্য আদালতের কাছে দায়বদ্ধ।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতীয় সংবিধান বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য পর্যাপ্ত বিধান দিয়েছে এবং নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগ সর্বদা তৎপর। তাই বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সংবিধানের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও ভারতীয় প্রেক্ষাপটে আইনের অনুশাসনের মৌলিক নীতি গুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না তবুও পরিস্থিতির প্রয়োজন মেটানোর জন্য এটি সময়ে সময়ে আইনের অনুশাসনের প্রয়োগকে নিশ্চিত করে। যে কোনো সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে আইনের অনুশাসন হচ্ছে শাসনের মৌলিক নীতি। এটি স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী। ভারতের মত একটি গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

❖ ২.১৯ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Powers):

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল, রোমান দার্শনিক পলিবিয়াস (Polybius) ও সিসেরো (Cicero), ফরাসি দার্শনিক বোদাঁ, ইংরেজ দার্শনিক জন লক্ ও হ্যারিংটন (Harrington) প্রমুখের রচনার মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ ও সমর্থন থাকলেও এই নীতির চরম বিকাশ ঘটে ফরাসি দার্শনিক মতেস্কু এবং ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone)-এর হাতে। 1748 সালে প্রকাশিত 'স্পিরিট অব দ্য লজ' (Spirit of the Laws) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মতেস্কু ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। 1765 সালে প্রকাশিত তাঁর 'কমেন্টারিজ অন দ্য লজ অব ইংল্যান্ড' (Commentaries on the Laws of England) নামক গ্রন্থে ব্ল্যাকস্টোনও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন।

❖ ২.২০ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Separation of Power):

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের কার্যাবলী কে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- আইন বিভাগীয় কাজ, শাসন বিভাগীয় কাজ এবং বিচার সংক্রান্ত কাজ। সরকারের এই তিন প্রকার কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব যথাক্রমে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পালন করে। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ হল সরকারের এই তিনটি বিভাগের স্বতন্ত্রতা। আবার সরকারের এই তিনটি বিভাগ যখন স্বতন্ত্র ভাবে বা আলাদা আলাদাভাবে তাদের কার্যাবলী সম্পাদন করে তখন তাকে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ বলা হয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে সরকারের প্রতিটি বিভাগ নিজ বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলি করবে অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ বলতে শুধু সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে স্বতন্ত্র করা বোঝায় না, বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরও স্বতন্ত্রীকরণকে বোঝায়।

❖ ২.২১ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মূল নীতি (Principles of Separation of Powers):

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মূল নীতি গুলি হল-

(১) আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ- সরকারের এই তিনটি বিভাগ একে অপরের থেকে আলাদা থাকবে।

(২) সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজ করবে না। অর্থাৎ সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ আলাদা আলাদা কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

(৩) এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে না।

(৪) একটি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি একাধিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না।

❖ ২.২২ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বাস্তব প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তা (Implementation and Necessity of Separation of Powers):

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে প্রয়োগের স্তরে উন্নীত হয় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসি বিপ্লবের সময়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনাকালে হ্যামিল্টন, ম্যাডিসন প্রমুখ এই নীতিটির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নীতিটি গৃহীত হয়। 1789 সালে ফ্রান্সের গণপরিষদ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নীতিটি অপরিহার্য বলে ঘোষণা করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি রাষ্ট্রে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

মতেস্কুর মতে, যখন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হাতে একই সঙ্গে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ভার থাকে, তখন সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদ স্বৈরাচারী আইন প্রণয়ন করে তাকে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করতে পারে। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। আবার, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রভাব থেকে বিচার বিভাগকে মুক্ত না রাখলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ একান্ত অপরিহার্য। ব্ল্যাকস্টোনও জনগণের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করতেন। একই হাতে যাবতীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে ম্যাডিসন 'স্বেচ্ছাচারিতার সংজ্ঞা' বলে অভিহিত করেছেন।

❖ ২.২৩ ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের তাৎপর্য (Significance of Separation of Power):

এটি একটি প্রচলিত সত্য যে, যখনই কোনো প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে বড় ধরনের কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয় তখন অপসাশন, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা বেশি থাকে। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ এই অপব্যবহার রোধ করতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারী শাসন থেকে রক্ষা করে। তাই ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরের নীতির তাৎপর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হল:

➢ **প্রথমত:**

ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন। সরকারের তিন প্রকার কাজ তিনটি বিভাগ ও তিন শ্রেণির ব্যক্তির হাতে সমর্পিত হলে কোনো বিভাগ বা কোনো ব্যক্তিই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারবে না।

➢ **দ্বিতীয়ত:**

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ চালু থাকলে সরকারের প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যাবে। ফলে প্রত্যেক বিভাগ তার নিজ দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবে এবং সরকারি কাজকর্মে দায়িত্বশীলতা বাড়বে।

➢ **তৃতীয়ত:**

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে শ্রমবিভাগের সুবিধা লাভ করা যাবে। এই নীতি প্রযুক্ত হলে যে ব্যক্তি যে বিভাগের উপযুক্ত সেই ব্যক্তিকে সেই বিভাগে নিযুক্ত করা হবে এবং তাতে সরকারি কাজকর্মের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।

➢ **চতুর্থত:**

এই নীতি প্রবর্তিত হলে সরকারের প্রতিটি বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে এবং তাতে প্রতিটি বিভাগের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

❖ ২.২৪ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পর্যালোচনা (Review of the Separation of Power in Indian Context):

ভারতের সংবিধানে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ আছে যার মাধ্যমে অনেকেই এই ধারণা পোষণ করতে পারে যে, ভারতের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গৃহীত হয়েছে। কেননা, ভারতের সংসদ বা পার্লামেন্ট (যা লোকসভা ও রাজ্যসভা নিয়ে গঠিত হল রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন কেন্দ্রীয় স্তরে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী এবং রাজ্যপাল হলেন রাজ্যস্তরে সর্বোচ্চ শাসন বিভাগীয় পদাধিকারী এবং সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট এবং অন্যান্য অধিষ্ঠান আদালত হল বিচার বিভাগীয় সংস্থা।

অর্থাৎ এ কথা আমরা বলতে পারি যে, আইন প্রণয়নের জন্য ভারতে পার্লামেন্ট বা সংসদকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। শাসন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের 62 থেকে 72 নম্বর ধারার কথা বলা যেতে পারে। আবার, সংবিধান অনুসারে বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট ও অন্যান্য অধিষ্ট আদালতকে প্রদান করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের 32 নং ধারা ও 136 নং ধারা অনুযায়ী এবং হাইকোর্ট সংবিধানের 226 নং ধারা ও 227 নং ধারা অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা ভোগ করে। সংবিধানে বলা হয়েছে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন যদি মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তাহলে বিচার বিভাগ সেই আইনকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে। এই ধরনের বিভিন্ন ধারা পর্যবেক্ষণ করে অনেক আইনবিদ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মতবাদ গৃহীত হয়েছে।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের বিষয়টি দুটি দিক থেকে আলোচনা করা যায়। একটি হল কঠোর অর্থে এবং অপরটি হল ব্যাপক অর্থে। কঠোর অর্থে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদের অর্থ হল যখন সরকারের তিনটি বিভাগের কাজের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য থাকে এবং চেক ও ব্যালেন্সের একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। অন্যদিকে ব্যাপক অর্থে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদের অর্থ হল যখন সরকারের তিনটি বিভাগের কাজের মধ্যে কোনো সঠিক পার্থক্য থাকে না।

আইসি গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্যের মামলায় সংবিধান ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ সত্তাকে বাস্তবে নিয়ে আসে। যেমন, ভারতে কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে এবং এই তিনটি ক্ষেত্রেই বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ তাদের কার্যাবলী সম্পাদন করে এবং এক্ষেত্রে এক বিভাগ অন্যদের কাজে হস্তক্ষেপ করে না।

আমরা যদি সাংবিধানিক বিধানের মধ্যে দিয়ে যাই তবে আমরা দেখতে পাবো যে, ভারতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ধারণা কঠোর অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের তিনটি বিভাগের কার্যাবলী ওভারল্যাপিং হয়। আবার, অনেক ক্ষেত্রে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রণীত কোনো আইন সংবিধান অনুযায়ী না হলে সুপ্রিমকোর্ট তা বাতিল করেও দিতে পারে। শাসন বিভাগ কর্তৃক বিচারক ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগের কারণে বিচার বিভাগের কার্যকারিতাতেও অনেক সময় প্রভাব পড়ে।

ইন্দিরা গান্ধী বনাম রাজ নারাইণ মামলায় আদালত বলেছিল যে, আমাদের সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ধারণা বৃহত্তর অর্থে গৃহীত হয়েছে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানের মত এখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ধারণা কঠোরভাবে প্রযোজ্য নয়।

রাম জাওয়া (Ram Jawaya) বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলায় বিচারপতি মুখার্জি পর্যবেক্ষণ করেছেন: ""In India, this doctrine has been not be accepted in its rigid sense but the functions of all three organs have been differentiated and it can be said that our constitution has not been a deliberate assumption that functions of one organ belong to the another. It can be said through this that this practice is accepted in India but not in a strict sense. There is no provision in Constitution which talks about the separation of powers except Article 50 which talks about the separation of the executive from the judiciary but this doctrine is in practice in India. All three organs interfere with each other functions whenever necessary." যদিও আমেরিকার সংবিধানের মতই ভারতীয় সংবিধানেও একটি সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে যে সংবিধানের 53 (1) ধারায় দেশের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে এবং সংবিধানের 154 (1) ধারা অনুযায়ী রাজ্যের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু সংবিধানে এমন কোনো বিধান নেই যে, আইন ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা কাদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি যে, ভারতে ক্ষমতার কোনো কঠোর বিভাজন নেই।

ভারতের সংবিধানের 50 নং ধারায় বিচার বিভাগ থেকে শাসন বিভাগকে পৃথক করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই ধারাটি নির্দেশমূলক নীতির অধীনে থাকায় তা কঠোরভাবে কার্যকরী হয় না। আবার, সংবিধানের 105

নং ধারা অনুসারে সংসদ বা আইনসভার সদস্যকে কিছু বিশেষ সুবিধা ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা আইনসভা কে স্বাধীন করে তুলে।

আমরা যদি সংবিধানের 368 নং ধারার কথা বলি যেখানে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে বলা আছে। এই বিষয়টি কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরালা রাজ্য মামলার ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত মৌলিক কাঠামোর ধারণার অধীন। এক্ষেত্রে বলা হয় সংসদ বা পার্লামেন্ট মৌলিক কাঠামো লংঘন করে এমন ভাবে কোনো আইন সংশোধন করতে পারে না। আর যদি তা মৌলিক কাঠামো লংঘন করে প্রণয়ন করা হয় তাহলে এ ধরনের সংশোধনী অসংবিধানিক বলে বাতিল ঘোষণা করা হবে আদালতের মাধ্যমে। সুপ্রিম কোর্টের রায় সংক্রান্ত এই মামলাটি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পারি যে, ভারতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ ঘটেছে। যদিও আমেরিকার সংবিধানের মত ভারতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কঠোর বিভাজন অনুসরণ করা হয় না, তবে চেক এন্ড বেলেন্সের ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। যাইহোক, যে বিষয়গুলি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ সেগুলিকে সরকারের কোনো বিভাগ পরিবর্তন করতে পারে না, এমনকি সংবিধান সংশোধন করেও নয়।

❖ ২.২৫ উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ মতবাদকে কঠোর অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। ভারতে যেহেতু সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত রয়েছে তাই এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং সমন্বয় থাকা উচিত। ভারতে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত; কিন্তু বাস্তবে মন্ত্রী পরিষদ সহ প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্রপতি শুধু নামমাত্র শাসক, প্রকৃত শাসক নন। সংবিধানের 74 (1) নং ধারা অনুযায়ী বলা হয়েছে শাসক প্রধানকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সহায়তা ও পরামর্শের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আচরণ করতে হবে।

ভারতের সংবিধানে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় আরেকটি ক্ষেত্রে, যথা- ভারতের সমস্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইনসভার ওপর ন্যস্ত থাকে তবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ সংসদের অধিবেশন যখন বন্ধ থাকে সংবিধানের 123 নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। আবার জরুরী অবস্থার সময়ও রাষ্ট্রপতি নিয়ম তৈরি করতে পারেন। কখনও কখনও রাষ্ট্রপতি বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। আবার, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে যখন ইমপিচমেন্ট পদ্ধতি আনা হয় তখন সংসদের উভয় কক্ষ সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রপতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়।

আবার, বিচার বিভাগ অনেক সময় আইন প্রণয়ন করতে পারে। যেমন- অধস্তন আদালতের জন্য নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রিত নিয়ম প্রণয়ন করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিচার বিভাগ সম্পাদন করে।

সুতরাং সংবিধানের বিভিন্ন ধারা গুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, ভারত একটি সংসদীয় সরকার হিসেবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা অনুসরণ করে না। ভারতে সরকারের তিনটি বিভাগ অনেক ক্ষেত্রেই মিলিতভাবে কার্যাবলী